বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা দর্শন ও উন্নয়ন ভাবনা

ডক্টর মোহাম্মদ রেজাউল করিম[১] এবং তানযিনা আক্তার[২]

Abstract

Education is regarded as foundation of the development of a society and is meticulously treated as the backbone of a nation. The importance is thus easily understandable how education contributes to the progressive development of a country in all socio-economic aspects. Education helps develop intrinsic qualities, enhances skills, expedites economic growth, harmonizes mental development, and inculcates established values and norms of the society. It also creates a learning society to establish it as the helm of practicing and establishing a venality-free country. Father of the nation of Bangladesh, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman struggled throughout his life to establish a peaceful country to find the beatific smile of general people. The necessity of education for building and developing a new state is undeniable which he learnt from the educational institutes and socio-cultural environment he had gone through. Thus, he put education at the forefront of the issues on which he placed more importance in the reconstruction of Bangladesh. This article sheds light on Bangabandhu's philosophy of education and development thinking, how he nurtured the underlying purpose of education, what steps he took to transform the education system of Bangladesh into a modern one, and above all how he wanted to institute education as a liberator of human liberation. To enrich this theoretical discussion, Bangabandhu's speeches, periodicals, books, and researches on Bangabandhu have been used, meaning that the article is based on secondary sources of data.

Keywords: Bangabandhu, Education, Language, Socio-Economic Development, Notional Policies

ভূমিকা

মানব সভ্যতার অগ্রগতি, সমাজ উন্নয়ন, দেশ ও জাতিগঠন ও উন্নয়ন সাধন সর্বোপরি মানুষের

---

১ উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা। ই-মেইল: rezapatc@gmail.com

২ সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার , ঢাকা। ই-মেইল: tanzina.bpatc@gmail.com

আত্মিক উন্নয়নে শিক্ষা একটি অপরিহার্য বিষয়। শিক্ষা ছাড়া একটি জাতি কখনই উন্নয়ন সাধন করতে পারে না বলেই শিক্ষাকে জাতির মেরুদন্ড হিসেবে তুলনা করা হয়। শিক্ষা তাই নিজস্বভাবে প্রস্ফুটিত হয়ে সমাজকে আলোকিত করার মাধ্যম হিসেবে দেখেছেন বার্ট্রান্ড রাসেল। আবার নেলসন ম্যান্ডেলা একে বিশ্বকে পরিবর্তন করার শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে অভিহিত করেছেন। বাঙালি কবি ও দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিক্ষাকে শুধুমাত্র তথ্য সংগ্রহের বলয়ের বাইরে পারিপার্শ্বিক সকল কিছুর সাথে সংগতি রেখে ব্যক্তি জীবনের সাদৃশ্যপূর্ণ অভিযোজন হিসেবে বর্ণনা করেছেন (করিম ও নন্দি, ২০১৩)। মহাত্মা গান্ধীর মতে শিক্ষা হচ্ছে শরীর, মন ও মননের উন্নয়নের মাধ্যমে একজন শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ। বিশ্বমনীষী, দার্শনিক, সমাজচিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রনায়কগণ প্রত্যেকেই শিক্ষার গুরুত্বকে উপলব্ধি করে যেমন তাত্ত্বিক আলোচনাকে সমৃদ্ধ করেছেন, অন্যদিকে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। শিক্ষা সংশ্লিষ্ট চিন্তাবিদদের নিয়ে, তাঁদের সুপরামর্শে রাষ্ট্রক্ষমতার অধিনায়কগণ সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন (কুদরত-ই-খুদা ও অন্যান্য, ১৯৭৪; হোসেন ও অন্যান্য, ২০২১)। একটি নতুন রাষ্ট্র বির্নিমাণ ও উন্নয়ন সাধনের জন্য শিক্ষার অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। এই সুগভীর সত্যটি অনুধাবন করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ পুনঃগঠনে যেসব বিষয়ের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন শিক্ষা তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে। আর তাই শিক্ষা হচ্ছে একজন ব্যক্তির আত্মিক উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বকে ইতিবাচকভাবে পরিবর্তনের মাধ্যমে বিকশিত করা যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ, উন্নততর রাষ্ট্র এবং সবার জন্য বসবাসযোগ্য একটি সুন্দর পৃথিবী । বঙ্গবন্ধুর চিন্তা ও চেতনায়, মননে ও মস্তিষ্কে, কথা ও কাজে সেই সুন্দর পৃথিবীর কথাই বারবার প্রতিধ্বনিত হতো। তিনি এমন এক শিক্ষা প্রচলন করতে চেয়েছিলেন যার মাধ্যমে একটি সুন্দর বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবে; প্রতিষ্ঠিত হবে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজ (রহমান, ২০২০; আহমেদ, ২০২১)।

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা দর্শন ও উন্নয়ন ভাবনা বিষয়ে তার ব্যক্তিগত শিক্ষা অর্জন, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক অধিকার আদায়ে আন্দোলন, পারিপার্শ্বিক সমাজব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে শিক্ষা পরিচালনা পদ্ধতি দ্বারা অনুপ্রাণিত। যার ফলশ্রুতিতে বঙ্গবন্ধুর কাছে শিক্ষা শুধু অধিকার হিসেবে নয় বরং মানুষের মুক্তির কার্যকরী অনুষঙ্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাঠামোগত প্রাতিষ্ঠানিক পরিমন্ডলের বাইরে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা সম্পর্কিত জ্ঞান, ধ্যান-ধারণা দর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (Dhaka University Talk, 2020; ঠাকুর ২০১৬)।

এ প্রবন্ধটিতে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা দর্শন ও উন্নয়ন ভাবনা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে কীভাবে তাঁর মানসপটে শিক্ষার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য লালিত হয়েছে, তিনি বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় রূপান্তরকরণের জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এবং সর্বোপরি মানবমুক্তির বৈতরণী হিসেবে কীভাবে শিক্ষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এই তাত্ত্বিক আলোচনাকে সমৃদ্ধ করতে বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন সময়ের ভাষণ, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা বই ও গবেষণা ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ প্রবন্ধটি মূলত পরোক্ষ তথ্যের ভিত্তিতে লিখিত ।

বঙ্গবন্ধুর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ এবং সমাজ দর্শন

বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত দর্শন ও শিক্ষা আবর্তিত হয় তাঁর স্কুল-কলেজে গৃহীত শিক্ষার মধ্য দিয়ে যা তিনি ধারণ করেছেন এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে তা প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁর দর্শন অর্জিত ও সংগঠিত হয়েছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা লাভের মধ্য দিয়ে। তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনা আবর্তিত হয় অন্যের জন্য কাজ করা, সমাজের বৈষম্য কমানো, দাঙ্গারোধে ভূমিকা রাখা, অধিকার আদায়, শিক্ষায় বিনিয়োগ, পড়াশোনায় আত্মনিয়োগ নিয়োগ করার মত বিষয়গুলোতে। এর প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় তার বিভিন্ন লেখায় ও বক্তৃতায়।

দেশ গঠনে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে এবং সমাজের বৈষম্য কমাতে সংবিধানের বড় একটি ভূমিকা রয়েছে। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা অধিকার হিসেবে আদায়ের জন্য একটি ভিত্তি স্বরূপ কাজ করে। সংবিধানে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার উল্লেখ রয়েছে, যেমনঃ ১৭ নং অনুচ্ছেদে বলা আছে;

১। “একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান।”

২।“সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করা এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ উদ্দেশ্য যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রনোদিত নাগরিক সৃষ্টি।”

৩।“আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।”

অর্থাৎ, সাংবিধানিকভাবেই সকলকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষা দিতে হবে। দেশকে পুরোপুরি নিরক্ষরমুক্ত করতে শুধু শিক্ষাটা দিলেই হবে না, সমাজ-রাষ্ট্র কীভাবে চাচ্ছে এবং কীভাবে সেটা ব্যবহার করা হবে সে ব্যবস্থাও নির্ধারণ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে যাঁরা শিক্ষা প্রদান করবেন তাঁদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও থাকতে হবে। মানুষ এবং দেশের উন্নয়নের জন্য কাজে লাগবে সেরকম প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। সাংবিধানিকভাবে এগুলো অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যেকোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে একজন মানুষের শিক্ষাগ্রহণ করতে পারার অধিকার একটি পূর্বশর্ত রূপে কাজ করবে। বাস্তবিকরূপে, রাষ্ট্রের কাছে একজন নাগরিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ প্রত্যাশা করতে পারবে। অন্য কথায়, ছাত্র-শিক্ষক বা দেশের কোন নাগরিক সঠিক শিক্ষার দাবি তুলতে পারে। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার জন্যই প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

স্বাধীনচেতা মানুষ নিজেকে গড়ে তুলতে লেখাপড়া করার প্রয়োজনীয়তা বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাঁর অর্জিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতিফলন পাওয়া যায় বিভিন্ন কর্মকান্ডে। সেই সাথে তাঁর মাঝে রাজনৈতিক চেতনা ও জাগ্রত ছিল। তিনি কলকাতায় থাকাকালীন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে কাজ করে গেছেন। ১৯৪৭ সালের পর পাকিস্তান যখন তৈরী হয় তখন তিনি বলেন,

"আমি ভাবতাম পাকিস্তান হয়েছে, চিন্তা কী ? এখন ঢাকা যেয়ে ল' ক্লাসে ভর্তি হয়ে কিছু দিন মন দিয়ে লেখা পড়া করা যাবে। চেষ্টা করবো, সমস্ত ছাত্রলীগ কর্মীদের নিয়ে যাতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা না হয়" (রহমান, ২০১২, পৃঃ ৫৬)।

শিক্ষা সংশ্লিষ্ট আন্দোলনের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর সম্পৃক্ততা তাঁর সমগ্র জীবনে পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয়। ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাংগঠনিক তৎপরতার কেন্দ্রে ছিলেন বঙ্গবন্ধু। তিনি দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলন ও বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন এবং অন্যদেরকে উৎসাহ ও নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন। তেমনিভাবে, খাদ্যসমস্যা, শিক্ষাসংকট, ভাষা আদায়সহ সকল আন্দোলন তরান্বিত করতে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১৯৪৮ সালে জেলখানায় বন্দী থেকেও তিনি কথা বলে গেছেন ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে বাংলা ভাষার অধিকার অর্জনের জন্য। তিনি যখন নাজিমুদ্দিন রোডের জেলখানায় ছিলেন তখন পাশের বালিকা বিদ্যালয়ের মেয়েরা "রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই" বা "বন্দীদের মুক্তি চাই" বলে ভাষার দাবিতে আন্দোলন করছিলেন যা তাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি অন্যদের সাথে আলোচনা করেছিলেন যে, আমাদের বোনেরা সোচ্চার হয়েছে। তাঁর বিশ্বাস ছিল আমরা অবশ্যই বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে আদায় করতে পারবো। এর থেকে প্রতীয়মান হয় তিনি সমাজ বিনির্মানে মেয়েদের অংশগ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করেছিলেন (রহমান, ২০১৮)।

বঙ্গবন্ধুর জীবনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থশ্রেণীর কর্মচারিদের আন্দোলনের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য ছাত্রাবস্থায় বহিস্কৃত হওয়া। এরপর তিনি আর ছাত্র হিসেবে আন্দোলনে যোগ দিতে পারেননি। এ থেকে তাঁর একটি আদর্শ, নিজের থেকে অন্যদের প্রতি বেশি যত্নবান হওয়ার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। এর মধ্য দিয়েও শিক্ষার উপর তাঁর গুরুত্বারোপ অনুধাবন করা যায় কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারিরা শিক্ষা প্রদানের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। কর্মচারিদের নায্য অধিকার আদায় হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভালো থাকবে আর শিক্ষা ব্যবস্থা ঠিক থাকবে। দেশের মানুষ সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবে। পরবর্তিতে দেখা গেছে তিনি ছাত্রদের সাথে আন্দোলন করেছেন, একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। ছাত্রদের '৫৪, '৬৩ বা '৬৯ সালের কাজের সাথে তিনি ছিলেন। কখনো কখনো কারাগারে থেকেও তিনি সমর্থন করে গেছেন। দেখা যায়, বঙ্গবন্ধুর

সমগ্র জীবনের বিভিন্ন আন্দোলনে শিক্ষার সম্পৃক্ততা ছিল।

শিক্ষা সমাজ তথা জাতি গঠনে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলে শিক্ষা কিভাবে পরিচালিত হবে তা তিনি চিন্তা করেছেন। শিক্ষাকে তিনি জাতি গঠনের জন্য বিনিয়োগ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাই, ২৮ অক্টোবর ১৯৭০ সালে জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন,

"সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা খাতে পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর হতে পারেনা। জাতীয় উৎপাদনের শতকরা কমপক্ষে ৪ ভাগ সম্পদ শিক্ষা খাতে ব্যয় হওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। কলেজ ও স্কুল শিক্ষকদের বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। দারিদ্র যাতে উচ্চ শিক্ষার জন্য মেধাবী ছাত্রদের অভিশাপ হয়ে না দাঁড়ায় সেদিকে সৃষ্টি রাখতে হবে"। (মোমেন, ২০২০)

শিক্ষার মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন সাধনে শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ বাড়ানো দরকার যা বর্তমানেও অনেক কম (১.২৯%)। তার মানে শিক্ষাকে গুরুত্বপূর্ণ বা বিনিয়োগের উৎকৃষ্ট খাত হিসেবে দেখা হচ্ছে না। কিন্তু, শিক্ষকদের বেতন না বাড়ালে জাতিকে মানসম্মত শিক্ষা প্রদান ঝুঁকির মুখে পড়বে। বঙ্গবন্ধু প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের কথা বিশেষভাবে বলেছেন কেননা প্রাথমিক শিক্ষাই একজন ছাত্রের বুনিয়াদ গড়ে তোলে। এর সাথে নজরে আনার মত আরেকটি বিষয় হল দারিদ্র। ২০১৯ সালে দেশে প্রায় ২০.৫ শতাংশ লোক দারিদ্র সীমার নিচে (বিবিএস, ২০১৯) এবং প্রায় ১০.৫ শতাংশ মানুষ চরম দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করছে (বিবিএস, ২০১৯)। বঙ্গবন্ধু ভেবেছেন দারিদ্র যেন মেধাবী ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার অন্তরায় না হয়। তাই, শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটু অন্যভাবে সাজাতে হবে; বৃত্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে। ছাত্রদের জন্য পুষ্টি ও শিক্ষা সরঞ্জাম নিশ্চিত করা হল বিনিয়োগ, যেমন; সন্তানদের নতুন বই কিনে দিলে তারা সেটা পড়ে সামাজিক মূল্যবোধগুলো গ্রহণ করতে পারবে। এ বিষয়গুলো তাদের মধ্যে পড়াশুনার আগ্রহ তৈরি করবে। এ বিনিয়োগের মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে মানুষ জীবনবোধ, ব্যক্তিত্ববোধ, মানবিকতাবোধ, পেশাদারিত্ব ও বিশ্বকে দেখার নতুন জ্ঞান আহরণ করে। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ তৈরি হয়। শিক্ষার একটি দিক হিসেবে প্রশিক্ষণও মানুষের মাঝে পেশাদারিত্ব সৃষ্টি করে, যেমনঃ কম্পিউটার বা ইন্টারনেটের ব্যবহার জানা একজন মানুষকে অন্য ব্যক্তিদের থেকে বেশি পারদর্শী হিসেবে উপস্থাপন করতে পারে। বর্তমানে ইন্টারনেট ব্যবহার করে শিশু-কিশোররা অনেক বিষয় নিজেরা শিখতেও পারছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকেও মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে যা তাকে জীবনকে সুন্দরভাবে দেখার অনুপ্রেরণা যোগায়। এবিষয়গুলো বঙ্গবন্ধুর শিশুকাল থেকে তাঁর বিভিন্ন ভূমিকার মাধ্যমে দৃশ্যমান হয়।

বঙ্গবন্ধুর দর্শন ছিল একটি সুখী সমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যার প্রস্তুতিস্বরূপ তিনি ছাত্রদেরকে পড়াশোনার পাশাপাশি মানুষ হওয়ার দীক্ষা নিতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে নকল করে পাস করার বিষয়ের বিরোধিতা করে তিনি ছাত্রদের উদ্দেশে বলেন,

"আমার ছাত্র ভাইয়েরা, লেখাপড়া করুন। আমি দেখে খুশি হয়েছি, আপনারা নকল টকল বন্ধ করেছেন"। আবার, তিনি শিক্ষকদের উদ্দেশ করে বলেন, "আপনারা লেখাপড়া শেখান, আপনারা তাদের মানুষ করুন" (মোমেন, ২০২০, পৃঃ ৫৫৭)।

তিনি তাঁর কথার মধ্য দিয়ে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য যে মনুষ্যত্ববোধ তৈরি করা তা প্রকাশ করেছেন।

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চর্চায় মাতৃভাষা

একটি জাতির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে তার নিজস্ব সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে। সেই সাথে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য বিদেশী ভাষা চর্চাও আবশ্যক। বঙ্গবন্ধু এদেশের শিক্ষার বিকাশের জন্য একটি সম্মিলিত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন যার মূল বিষয়গুলো ছিল; মাতৃভাষায় শিক্ষা, সর্বত্র বাংলা চর্চা, নববর্ষ পালন, বিদেশে নিজ ভাষা ও সংস্কৃতির প্রচার, ভাষা আন্দোলন, সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, বাংলা একাডেমি, অনুবাদ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি।

বঙ্গবন্ধু যতবার বিদেশ ভ্রমণে গিয়েছেন তাঁর একটি উদ্দেশ্য ছিল সেদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষার মাধ্যম দেখা। তিনি চীন ভ্রমণকালে বাংলায় ভাষণ দিয়েছিলেন। তিনি বাংলাকে বিশ্বের বুকে পরিচিত করতে চাইতেন কেননা পৃথিবীর খুব কম ভাষার জন্যই মানুষ জীবন বিসর্জন দিয়েছে। বঙ্গবন্ধু তাঁর 'আমার দেখা নয়া চীন' বইয়ে চীনের ভাইস চ্যান্সেলরের সাথে কথোপকথন ব্যাখ্যা করেছেন। তারা দোভাষীর মাধ্যমে আলাপচারিতা করছিলেন। দোভাষী যখন ২/১ জায়গায় ভালোভাবে ইংরেজি বলতে পারছিলেন না তখন সেখানে ভাইস চ্যান্সেলর নিজেই তাকে ইংরেজি করে দিচ্ছিলেন। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

"ভদ্রলোক ভালো ইংরেজী জেনে ও ইংরেজী বলেন না । জাতীয় ভাষায় কথা বলেন, আমরা বাঙ্গালি হয়ে ও ইংরেজী আর উর্দু বলার জন্য পাগল হয়ে যাই। বলতে না পারলে এদিক ও দিক করে বলি" (পৃঃ ৬৮)।

এখান থেকে দেখা যায় চীনের ভাইস চ্যান্সেলর ভালো ইংরেজি জানার পরও মাতৃভাষায় কথা বলছিলেন। আর বাঙ্গালীরা মনে করেন অধিক শিক্ষিত মানুষ ইংরেজিতে কথা বলেন। এই দুর্বলতাটা বঙ্গবন্ধু তখনই দেখতে পেয়েছিলেন। এখনো অনেক শিশুদের দেখা যায়

স্যাটেলাইটের বদৌলতে হিন্দি ভাষা ভালো বলতে পারে। তাদেরকে মাতৃভাষার মর্ম বোঝাতে হবে। পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু বাংলা একাডেমিকে, ১৯৭২ সালের ১৭মে তারিখে এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে, বাংলা ভাষায় উচ্চশিক্ষার পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন, প্রকাশ, গবেষণা, বিজ্ঞান, কারিগরি, প্রকৌশল ও বৃত্তিমূলক বইয়ের বাংলা, অনুবাদ এবং মৌলিক পুস্তক রচনার দায়িত্ব প্রদান করেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে টেকনোলজিক্যাল বিষয়ও নিজস্ব ভাষায় প্রদান করা হয়, যেমনঃ থাইল্যান্ডে নিজস্ব ভাষায় ফেসবুক বা ইউটিউব ব্যবহারের নিয়ম নিয়ে বই পাওয়া যায়। নিজের ভাষার মাধ্যমে জানতে হবে বিশ্ব কীভাবে এগোচ্ছে বা পরিবর্তিত হচ্ছে। বঙ্গবন্ধুও সেখানে গুরুত্ব দিয়ে গেছেন।

'আমার দেখা নয়া চীন' বইয়ে বঙ্গবন্ধু চীনের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থার কথা এমনভাবে উল্লেখ করেছেন যে সেখানে আর (কেরানি পয়দা) করা হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষা, শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং, টেকনিক্যাল শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিলেন। সেখানকার এক প্রফেসর, মি. হালিম, বলেছিলেন,

"বাধ্যতামূলক ফ্রি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছি। প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে স্কুলে দিতে হয়। সরকার তাদের যাবতীয় খরচ বহন করে" (পৃঃ ৬০)।

এখান থেকে বোঝা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় হবে মানুষ গড়ার কারখানা। কারিগরি শিক্ষার উপর আজকাল গুরুত্বারোপ করা হলেও বঙ্গবন্ধু তা পঞ্চাশের দশকে, একাত্তরের নির্বাচনের পূর্বে এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বলে গিয়েছিলেন। অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা বাংলাদেশে শুরু হয়েছে নব্বইয়ের দশকে। তিনি আরও লিখেছেন,

"আমাদের দেশে অর্থশালী জমিদাররা 'প্রিভিলেজড ক্লাস' অন্য দেশে শিল্পপতিরা, 'প্রিভিলেজড ক্লাস' কিন্তু নতুন চীনে দেখলাম শিশুরাই (প্রিভিলেজড ক্লাস) (পৃঃ ৬০)।

চীন শিশুদেরকে যেভাবে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল তা দিয়ে চীন আজ উন্নত একটি দেশ। কারণ, আজকের শিশুরা বড় হয়েই আগামী দিনের সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখবে এবং অন্যদের নেতৃত্ব দিবে, তারাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাই, তাদের উন্নয়নের জন্য আমাদের কাজ করতে হবে, তাদেরকে সত্যিকার মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। বঙ্গবন্ধু এটাও লক্ষ্য করেছেন যে, চীন শিক্ষা ব্যবস্থায় কারিগরি জ্ঞানের গুরত্ব দিচ্ছে। ১৯৫০-এর দশকে বঙ্গবন্ধুর সেই উপলব্ধির সুফল দেখতে পাই যখন আশির দশকে চীনের মাথাপিছু আয় বাংলাদেশ থেকে কম ছিল কিন্তু বর্তমানে তা অনেক বেশি। আশির বা নব্বইয়ের দশকে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম বাংলাদেশ তাইওয়ান বা কোরিয়া থেকে আসতো, কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বাজারে

প্রায় সবকিছুই চীনে উৎপাদিত পণ্য। তাই, বাংলাদেশকেও শিশুদের শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে হবে, তবেই তারা পরবর্তীতে পিতা-মাতা, সমাজ ও দেশের প্রতি দায়িত্বশীল হবে এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

শিক্ষার প্রতি বঙ্গবন্ধুর দরদ সর্বদাই দৃশ্যমান। চীনে গিয়েও তিনি সহযাত্রীকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ভ্রমণে যান। বন্ধ থাকা সত্ত্বেও নানকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন প্রফেসর এবং কিছু ছাত্র তাকে বরণ করে নিয়েছিল, খাবারের আয়োজন করেছিল। হল রুমে ছোট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা, প্রফেসর সংখ্যা, নতুন নতুন ডিপার্টমেন্ট খুলতে ভবন নির্মাণে সরকারের সহয়তা ইত্যাদি তথ্য প্রদান করেন। "আমার দেখা নয়া চীন" বইয়ে তিনি লেখেন,

"আমরা ক্লাসরুম দেখলাম, বিজ্ঞান শাখা দেখলাম, বিদেশী এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট দেখলাম" (পৃঃ ৬৭)।

এখানে বঙ্গবন্ধু আলাদা করে বিজ্ঞান শাখার উপর জোরারোপ করেছেন, কেননা বিজ্ঞান চর্চা ছাড়া দেশ এগুবে না। আবার, শিক্ষাকে নিজের দেশে সীমাবদ্ধ না রেখে অন্য দেশ থেকেও আহরণ করতে হবে, যেমনঃ ষাটের দশকে কোরিয়ান একটি দল এসেছিলেন বাংলাদেশের আদমজী জুট মিল-এর ব্যবস্থাপনা দেখতে। তখন তাদের মাথাপিছু আয় বাংলাদেশ থেকে কম ছিল। কিন্তু, আজ সে মিল বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ, বর্তমানে তাদের প্রস্তুতকৃত স্যামসাং মোবাইলে বাংলাদেশের বাজার সয়লাভ যা প্রমাণ করে বাংলাদেশ তাদের মত উন্নতি করতে পারেনি। অন্যান্য দেশ থেকে এই শিক্ষাটি গ্রহণ করতে হবে। পাটের জিনোম আবিস্কার করা বাঙ্গালী বিজ্ঞানী মাকসুদুল আলমকে তৎকালীন কৃষি মন্ত্রী আমেরিকা থেকে অনুরোধ করে নিয়ে এসেছিলেন নিজভূমে কাজ করার জন্য। ধারণা করা হয় শুধু বিনিয়োগের অভাবে গবেষণাচর্চা বেশি দূর এগোয়নি। এমনিভাবে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাঙালি যারা কাজ করছেন তাদের জ্ঞান আমরা দেশের উন্নয়নের জন্য কাজে লাগাতে পারি। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে আমাদের দেশের মেধাবী ব্যাক্তিরা কাজ করে সেদেশকে সমৃদ্ধ করছে।

বঙ্গবন্ধু সর্বদাই মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদানে গুরুত্ব প্রদান করেছেন। ১৯৫৬ সালে করাচীতে দেয়া ভাষণে তিনি অন্যান্য ভাষার (উর্দু, সিন্ধ, পাঞ্জাবী) সাথে বাঙলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উথাপন করেছিলেন। পকিস্তানের অন্যান্য ভাষাভাষী মানুষদের এভাবেই সম্মান প্রদর্শন করেছেন তিনি কেননা, তিনি বিশ্বাস করতেন একটি দেশের উন্নয়নে শিক্ষা দরকার যা সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ হয় মাতৃভাষার মাধ্যমে। দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজি জানতে হবে যা এখন একটি প্রযুক্তি। বাংলা ভাষার প্রতি দরদ তাঁর কথা-কাজে প্রকাশিত হতে দেখতে পাওয়া যায়,

"বাংলা আমার মাতৃভাষা। মাতৃভাষায় বক্তৃতা করাই উচিত। কারণ পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলনের কথা দুনিয়ার সকল দেশের লোকই কিছু না কিছু জানে। দুনিয়ার সকল দেশের লোকই যার যার মাতৃভাষায় বক্তৃতা করে। শুধু আমরাই ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করে নিজেদের গর্বিত মনে করি" (রহমান ২০২০, পৃঃ ৪৩)।

বর্তমানে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে গৃহীত হওয়ার পেছনে তাঁর অবদানও কম নয়। তিনি জানতেন বাংলায় ভাষণের মাধ্যমে বিশ্বের বুকে তিনি বাংলাকে পরিচিত করতে পারবেন। তিনি এতটাই ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন যে ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে তিনি বাংলায় ভাষণ দিয়েছিলেন যার মধ্য দিয়ে বাংলাকে আন্তর্জাতিকভাবে তুলে ধরার সুযোগ তৈরী হয়। এর মধ্যেই নিহিত ছিল বাংলা ভাষার আজকের আন্তর্জাতিকীকরণের সুপ্ত পদক্ষেপ।

বঙ্গবন্ধু বাঙালি সংস্কৃতি নিয়ে গর্ববোধ করতেন। যা আমরা তাঁর বিভিন্ন ভাষণে উল্লেখ পাই। তিনি নিজেকে বাঙালি হিসেবে পরিচয় দিতে দ্বিধা করতেন না। তাঁর জীবনে বাঙালি সংস্কৃতি ও নববর্ষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখতে পাওয়া যায়। পাকিস্তান সরকার আমলে, ১৫ এপ্রিল ১৯৬৭, পহেলা বৈশাখে জেলখানার রাজবন্দীরা কয়েকটা গোলাপ ফুল দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান। বঙ্গবন্ধু তেমনি বিভিন্ন সেলে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানানোর মাধ্যমে বাঙ্গালির এই সংস্কৃতি উৎযাপন করেন। মিজানুর রহমান চৌধুরী তাকে কবিতা (আজিকে নতুন প্রভাতে নতুন বর্ষের আগমনে---মুজিব ভাইকে) লিখে পাঠিয়েছিলেন। এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা কতটা গুরুত্ব সহকারে তিনি পালন করতেন।

বঙ্গবন্ধুর উপলব্ধির সাথে রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতির কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

"তুমি যাহা শিক্ষা করিতেছ তাহা হওয়ার মতো কোন ক্রমেই স্কুল মাষ্টারি পর্যন্ত উড়িয়া তাহার পর পেনশনভোগী জরা জীর্ণতার মধ্যে ছাই হইয়া মাটিতে আসিয়া পড়িবার জন্য নহে। ইংরেজ ছেলেদের শিক্ষার প্রণালী এরূপ নহে অক্সফোর্ড, ক্যামব্রিজ তাদের ছেলে কেবল যে গিলিয়া থাকে তাহা নহে, তারা আলোক-আলোচনা ও খেলা হইতে বঞ্চিত হয়না"(ঠাকুর, ২০১৬)।

শিক্ষা শুধু চাকরি পাওয়ার বা জীবিকা অর্জনের জন্য নয়, সমাজের মানুষের জন্য কাজ করবার জন্য প্রয়োজন। শিক্ষা মানে শুধু পড়াশুনা করাই নয়, বরং জ্ঞান বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা ও শরীরচর্চার মাধ্যমে সুস্থদেহ গঠন করাকেও বোঝায় (রহমান, ২০২০)। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে ১৯৪৯ সালে বঙ্গবন্ধু যখনই রাজনৈতিক কোন বিষয়ে আলোচনা বা দাবি উত্থাপনের সুযোগ

পেয়েছেন তখনই নারীদের শিক্ষার উপর জোড় দিয়েছেন কেননা একজন শিক্ষিত নারীই একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দিতে পারেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের ম্যানিফেস্টোতে নারী-পুরুষের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষা নিশ্চিত করতে বৃত্তি ও মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাসহ শিক্ষা নীতি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা ছিল। মাতৃভাষার শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ সবচেয়ে বেশি উপকৃত হতে পারে কেননা তাঁর উপলব্ধি গভীর হয়। অন্য ভাষায় শিক্ষা বাংলায় অনুবাদ করে বুঝতে গেলে তা সময় সাপেক্ষ হয়ে যায় এবং তা মাতৃভাষার মত হৃদয় স্পর্শ করে না।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের আগে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহারের ২১ দফার দুটিতে শিক্ষার উল্লেখ ছিল। সেখানে বঙ্গবন্ধু পূর্ববর্তী ধারাবাহিকতা বজায় রেখে শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত বেতন-ভাতাসহ শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের প্রস্তাব করেছিলেন। আমূল সংস্কার বলতে তিনি সময়ের সাথে যুগোপযোগী শিক্ষার কথা বলেছেন যা গ্রহণ করে মানুষ তাঁর জীবিকা অর্জনের পথ নিশ্চিত করতে পারে, যেমনঃ বিভিন্ন বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার পথ সুগম করা যায়। গণপরিষদের সদস্য হিসেবেও ভাষণ দেয়ার সময়ও তিনি বারবার শিক্ষার মান কিভাবে বাড়াতে হবে, অবৈতনিক করতে হবে, কোন স্তর (নিম্নস্তর থেকে উচ্চতর) পর্যন্ত করতে হবে, মাতৃভাষায় শিক্ষা (শুধুমাত্র বাংলা নয়) প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে কথা বলেছেন।

রাষ্ট্রীয় নীতি-কাঠামোতে শিক্ষার অন্তর্ভুক্তিকরণ

বঙ্গবন্ধু সব সময় শিক্ষাকে রাজনীতির একটা অংশ হিসেবে এনেছেন কেননা শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অর্জন রাজনৈতিক বা ক্ষমতাসীন দল বা সরকারের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে। তাই তিনি শিক্ষাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন। তদপরি, দেশ-বিদেশ যেকোন স্থানেই যেকোন আন্দোলন সফল করার জন্য ছাত্রসমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই তিনি রাজনৈতিক বিষয়সমূহের পাশাপাশি ছাত্রসমাজ তথা শিক্ষকদের অর্থনৈতিক মুক্তির দিকও বিবেচনা করেছেন। তাই তিনি ৩০ জানুয়ারি ১৯৫৩ তারিখে উত্তরবঙ্গ সফরকালে এক ভাষণে বলেছেন,

“আমাদের সন্তানদের সুশিক্ষার কোন বন্দোবস্ত করা হচ্ছেনা।শিক্ষকরা বেতন পাচ্ছেনা। যখনই জনগণ ন্যায্য অধিকারের দাবিতে প্রতিবাদ করে তখনই মুসলিমলীগ সরকারের পুলিশ তাদের উপর গুলি চালায়”(মোমেন, ২০২০)।

এর থেকে ছাত্ররা ভাবে বঙ্গবন্ধু তাদের প্রাণের দাবি উত্থাপন করেছেন সুতরাং তাঁর সাথে কাজ করতে হবে। অবহেলিত শিক্ষক সমাজও তাঁর সাথে আন্দোলনে যোগ দিবেন যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির পথ দেখাবে। সরকার থেকে ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য তা সঠিকভাবে

অনুধাবন করতে শিক্ষা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ১৯৭৪

এই রিপোর্টটি কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট নামে বেশি পরিচিত। বঙ্গবন্ধুর পড়াশুনা, শিক্ষা গ্রহণ এবং বিদেশ ভ্রমণের প্রতিফলন এখানে দেখতে পাওয়া যায়। যুগান্তকারী একটি পদক্ষেপের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছেন। তিনি মানবিক দিক, ধর্ম নিরপেক্ষতা, চরিত্র গঠন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শিক্ষা-গবেষণা, নারীর অংশগ্রহণ এবং উচ্চ-শিক্ষার কথা সেখানে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন (ড. কুদরত-ই-খুদা ও অন্যান্য, ১৯৭৪)। এই কমিশনের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো:

* স্বাধীনতার পরপরই প্রাথমিক বিদ্যালয় গুলোর জাতীকরণ যার মূল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষকদের বেতন সমস্যার সমাধান

* কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ঘটানো

* নারী শিক্ষায় অগ্রধিকার প্রদান

* প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি

* বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন

* বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান

* জন প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা

* শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র, ক্রীড়া ও শরীরচর্চার উৎসাহিতকরণ

* বিশ্ব নাগরিকত্ব

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা দর্শনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বর্ণিত বিষয়গুলোর উপর গুরত্ব দিয়েছেন এবং কমিশন রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার যে বিষয়টি রিপোর্টে ছিল তা বর্তমান সরকার বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করছে। মেধাবী ছাত্রদের জন্য উচ্চশিক্ষার, যা বঙ্গবন্ধু বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলেন, তথা বিদেশে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে সরকার এখন বৃত্তি প্রদান করছে। ডিজিটাল সেবা সহজলভ্য হওয়ার কারণে অনেকে সহজে কর্মমূখী ও বৃত্তিমূলক

শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে। চাকরির জন্য অপেক্ষা না করে নিজে উদ্যোক্তা হতে পারছে। রিপোর্টে কৃষি শিক্ষার উপরও বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর ভাবনাগুলো যদি আমরা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারতাম তবে দেশে বেকারত্বের হার কমে যেত। আবার, একটি গবেষণায় দেখা গেছে উচ্চশিক্ষিতদের মাঝে বেকারত্বের হার আরও বেশি। বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রচলন করলে এত বেশি উচ্চ শিক্ষিত বেকার তৈরি হত না। আবার, কর্মসংস্থান ও বৃদ্ধি পেত।

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে ভাবনাগুলো পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রতিফলিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ্যতম শিক্ষকদের নিয়োগ দিয়েছিলেন। তিনি নিজে শিক্ষকদের অনেক সম্মান করতেন, যেমনঃ প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন সময়েও তাঁর কোন শিক্ষক তাঁর কার্যালয়ে গেলে তিনি উঠে দাঁড়াতেন এবং 'স্যার' বলে সম্বোধন করতেন।

শিক্ষা প্রশাসন ও বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষা প্রদান এমন একটি পবিত্র দায়িত্ব যা প্রতিপালনের মাধ্যমে একটি জাতি বিকশিত হয়। এই দায়িত্ব পালনের জন্য এমন এক দক্ষ জনগোষ্ঠী দরকার যারা প্রতিনিয়ত শিক্ষা নিয়ে ভাবেন, কাজ করেন। তাই বঙ্গবন্ধু প্রফেসর কবীর চোধুরীকে শিক্ষা সচিব এবং শিক্ষা কমিশনের সদস্য সচিব হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন (আনিসুজ্জামান, ২০১৬)। বঙ্গবন্ধু ব্যক্তিগত ভাবে অনুরোধ করে প্রফেসর মোজাফ্‌ফর আহমেদ চৌধুরীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, প্রফেসর আবুল ফজলকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে, প্রফেসর খান সারওয়ার মুরশিদকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেন। এই তিনজন শিক্ষক সমসাময়িক সময়ে জ্ঞানের দিক দিয়ে অন্যতম ও সবার সম্মানের পাত্র ছিলেন। তাঁদের দায়িত্বে শিক্ষা ব্যবস্থার এক উৎকর্ষতা সাধিত হয়েছিল।

শিক্ষকদের প্রতি বিশেষ দরদ ছিল বঙ্গবন্ধুর পরিকল্পনা কমিশন গঠন থেকেই বোঝা যায়। তিনি বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পনা কমিশন গঠনকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের দুইজন প্রফেসরকে অন্তর্ভুক্ত করেন। কমিশনে প্রফেসর নুরূল ইসলামকে ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং প্রফেসর রেহমান সোবহানকে অন্যতম সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। শিক্ষকদের দেশ ভাবনা মেধা, নীতি, মর্যাদা, আদর্শ, সমাজ গঠনে ভূমিকা, এই বিষয়গুলো দেশ উন্নয়নের কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। সেখানে উন্নয়ন পরিকল্পনার উৎকর্ষতা সাধনে গবেষণা কার্যক্রমের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

শোষণমুক্ত সমাজ গঠন এবং মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্যে শিক্ষা

বঙ্গবন্ধুর আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো; শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। তাই পুঁজিবাদী সমাজের মত শিক্ষা শুধু ধনীদের হাতের নাগালের বাইরে সবার জন্য আবশ্যকীয় করতে চেয়েছিলেন। বিশেষ করে তিনি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে গেছেন যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সমাজের বৈষম্য কমানো। সর্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষার পাশাপাশি দরিদ্রতা যেন উচ্চ শিক্ষার পথে বাধা না হয়ে দাঁড়ায় সেজন্য তিনি মেধাবী দরিদ্র ছাত্রদের জন্য বৃত্তির কথা বলে গেছেন। এছাড়া নারীদের অংশগ্রহণ, কর্মমূখী শিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। লক্ষ করা যায় যে, মাদ্রাসাগুলোতে তুলনামূলক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে থাকে এবং এদের চাকরির সুযোগও কম। তাই মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণের মাধ্যমে সমাজে অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পশ্চিম বাংলার মাদ্রাসা শিক্ষার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য একটি কমিটি পাঠিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু ভাষণ প্রদানকালে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরকেও সম্বোধন করে কথা বলতেন। কেননা, মেয়েদের পিছনে ফেলে একটি দেশের সামনে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ধারনা করা হয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের হেরে যাওয়ার একটি কারণ হল শুধু পুরুষ সৈনিকদের নিয়ে যুদ্ধ করা। বঙ্গবন্ধু চমৎকারভাবে লিখেছেন,

"সত্য কথা বলতে গেলে, একটা জাতির অর্ধেক জনসাধারণ যদি ঘরের কোণে বসে শুধু বংশবৃদ্ধির কাজ ছাড়া আর কোন কাজ না করে তাহলে সেই জাতি দুনিয়ায় কোন দিন বড় হতে পারেনা" (রহমান, ২০২০)।

অর্থাৎ, নারীদের ঘরের বাইরে এসে দেশের উন্নয়নে কাজ করতে হবে এবং জাতি গঠনে ভূমিকা রাখতে হবে। চীন ভ্রমণ অভিজ্ঞতার আলোকে সেই পঞ্চাশের দশকেই বঙ্গবন্ধু নারী উন্নয়নে ভূমিকা রেখে গেছে। বঙ্গবন্ধুর চিন্তা-চেতনায় সবসময় যে শিক্ষার উন্নয়ন ছিল তা বুঝতে পারা যায় ডিসেম্বর ১৯৪৮ সালে দৌলতপুর, খুলনার ছাত্র সভায় দেয়া ভাষণে তিনি বলেন,

"শিক্ষাদীক্ষা হইল মানব সভ্যতার মাপকাঠি-অথচ আমাদের অগণিত জনসাধারণকে অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবাইয়া রাখিয়া কোন মুখে আমরা বিশ্বের দরবারে নিজ দিগকে সভ্য জাতি বলিয়া গৌরব করিবো? আজ দেখিতে পাইতেছেন আমাদের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই ধ্বংস হইতে

বসিয়াছে, শিক্ষকদের বেতন না বাড়াইলে শিক্ষার সমস্যার সমাধান অসম্ভব”(এ কে আব্দুল মোমেন, ২০২০)।

এখানে তিনি সভ্য জাতি গঠনে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং শিক্ষকদের আর্থিক নিরাপত্তা প্রদানের বিষয়ে বলেছেন। একটি দেশের উন্নয়ন বা একটি দেশকে এগিয়ে নেয়ার জন্য, সমাজ গঠনে শিক্ষকদের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। তাঁর বলে যাওয়া কথা আজও আমাদের চলার পথে পাথেয় হয়ে জানান দেয়, শিক্ষা দ্বারাই একটি জাতির অন্ধকার দূরীভূত হয়ে সভ্য তার আগমন হয়।

তিনি ছাত্রদের পড়াশুনার ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে তিনি মুক্তি সংগ্রামে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা ছাত্রদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিপ্লব সাধনের উদ্দেশ্যে কাজ করে যেতে বলেন। তিনি বলেছিলেন,

“আমাদের একটি পরিকল্পনা তৈরীর নির্দেশনাসহ একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করতে চলেছি” (মোমেন, ২০২০, পৃঃ৩০৪)।

শিক্ষার একটি মূল উদ্দেশ্য হল মানুষকে দেশ প্রেমিক হিসেবে প্রস্তুত করা যার কথা তিনি বলে গেছেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর বিভিন্ন ভাষণে শিক্ষার পাশাপাশি জনপ্রশাসনের প্রশিক্ষণের কথাও বলে গেছেন। যার মাধ্যমে একজন দক্ষকর্মী হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন। যেমনঃএকজন কম্পিউটারে টাইপের কাজ করতে করতে অনেক দক্ষ হতে পারে। ২০ জুলাই ১৯৭৫ বঙ্গভবনে নবনিযুক্ত জেলা গভর্নরদের প্রশিক্ষণ কর্মসুচির উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন,

“আর আমাদের আইডিয়া হলো, একটা ট্রেনিং কোর্স, ট্রেনিং সেন্টার করুন। কেউ করে শেখে, কেউ দেখে শেখে, আর কেউ বই পড়ে শেখে। আর সবচেয়ে বেশি শেখে যে করে শেখে। আপনারা করে শিখবেন”(মোমেন, ২০২০)।

এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু হাতে কলমে শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন যাতে করে নিজে করে দক্ষতা অর্জন করতে পারে এবং ভালো সেবা দিতে পারে। যে সেবা এদেশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য; এদেশের মানুষের মঙ্গলের জন্য। একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনের জন্য শিক্ষিত ও দক্ষ জনগোষ্ঠী দরকার । যার ফলে তিনি ছাত্রদেরকে পড়াশোনার পাশাপাশি বাবা-মার কাজে সহযোগিতা করার কথা বলে গেছেন। স্কুল বন্ধের সময় যাতে তারা বাবা-মার সাংসারিক কাজে সহযোগিতা করতে পারে সে কথাও তিনি বলে গেছেন। এর মাধ্যমে এটা প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষার সাথে সরাসরি কর্মের সংযোগ থাকবে।

উপসংহার

মানবিকতার মূল্যবোধ, মনুষ্যত্ব ও দেশগঠনের শিক্ষা গ্রহণ করাই প্রকৃত শিক্ষা। সন্তানদেরও সেই শিক্ষা দিতে হবে যাতে মমত্ববোধ ও অন্যের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করে এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠে। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশপ্রেম ও মানবিকতার পরশ পাওয়া যায় তাঁর এই বক্তব্য থেকে,

"একজন মানুষ হিসাবে সমগ্র মানব জাতি নিয়েই আমি ভাবি।একজন বাঙ্গালি হিসাবে যা কিছু বাঙ্গলিদের সাথে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পত্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে"(মোমেন, ২০২০)।

বঙ্গবন্ধুর এই দর্শনই শিক্ষার আসল দর্শন। মানুষের প্রতি এই ভালবাসার কারণেই তিনি বঙ্গবন্ধু হতে পেরেছিলেন এবং মানুষের শ্রদ্ধা ভাজন হয়েছিলেন। যে মানুষগুলোর জীবনের বিনিময়ে আমরা দেশের স্বাধীনতা পেয়েছি তাদের বিসর্জনের কথাও বঙ্গবন্ধু সব সময় বলেছেন। ৩০ লক্ষ শহিদ ও ২ লক্ষ আত্মত্যাগকারী নারীদের বিসর্জনের কথা স্মরণ করে সকলকে দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করতে হবে এবং সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সেই শিক্ষাই আসল শিক্ষা যা সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য মঙ্গলজনক। মূলত আসল শিক্ষা হচ্ছে দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করার শিক্ষা; দুর্নীতিমুক্ত দেশ, সমাজ ও প্রতিষ্ঠান গড়ার শিক্ষা (করিম, ২০১৫)। শুধু আত্মোন্নয়ন নয়, অন্যের কল্যাণে কাজ করা, সম্পদের পাহাড় না গড়ে মানুষের কল্যাণে কাজ করা। দেশের অর্থ বিদেশে পাচার না করে দেশের উন্নয়নে কাজ করার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষিত হয়ে শব্দের বেড়াজালে আবদ্ধ করে এমন ক্যামোফ্লেজ তৈরি না করি, যা শিক্ষিত সমাজ অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত মানুষকে হতভম্ব করে দেয়, যাতে সত্য আড়ালে পড়ে; অন্যায়ের সুযোগ অবারিত হয়। শিক্ষিত সমাজের অন্যায়ের ব্যাপারে, দায়িত্ব সচেতনতার বারবার উচ্চারিত বঙ্গবন্ধুর সেই শব্দমালা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে জনসাধারণ নায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। সচেতনতা বলতে মনুষ্যত্ববোধের শিক্ষা গ্রহণ করে এগিয়ে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে সবাইকে ভালো না রেখে নিজে ভালো থাকতে চাইলে কখনও সত্যিকার অর্থে ভালো থাকা যায়না; সেটা পৃথিবীর যে প্রান্তেই হোকনা কেন মনে রাখা আবশ্যক যে, মানুষের প্রতি বিশ্বাস না থাকলে মানুষ অনিরাপত্তায় ভোগে, দেশের সার্বিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। সর্বোপরি, সময়ের পরিক্রমায় একসময় আমরা থাকবনা, প্রতিষ্ঠান থাকবে, দেশ থাকবে। সেই দেশ, সমাজের জন্য কিছু করার শিক্ষাই বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা।

তথ্য নির্দেশিকা

রহমান আতিউর (২০২০), বঙ্গবন্ধু বাঙালি বাংলাদেশঃ নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়, প্যাঞ্জেরী পাবলিকেশন লিমিটেড, ঢাকা।

আনিসুজ্জামান (২০১৬), বিপুলা পৃথিবী, প্রথমা, ঢাকা।

ডক্টর মুহাম্মদ কুদরত-ই খুদা, ডক্টর সুরত আলী খান, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, এম ইউ আহমেদ, মাহমুদ মোকাররম হোসেন, মোহাম্মদ নুরুস সাফা, এম এ সাত্তার, আব্দুর রাজ্জাক, ফজলে হালিম চৌধুরী, আবদুল হক, আনিসুজ্জামান, স্বদেশ রঞ্জন বসু, নুরুল ইসলাম, এম শামসুল ইসলাম, আ কম জহুরুল হক, সিরাজুল হক, বাসন্তীগুহ ঠাকুরতা, আবু সুফিয়ান, মাযহারুল ইসলাম, এ এম, হক শরফুদ্দিন, নূরুল মুহম্মদ, মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, হেনা দাস, আশরাফ উদ্দিন খান (১৯৭৪), বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন ১৯৭৪, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

মোমেন এ কে আব্দুল (২০২০), ভাষণসমগ্র ১৯৫৫-১৯৭৫: শেখ মুজিবুর রহমান, চারুলিপি প্রকাশন, ঢাকা।

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ (২০১৬), শিক্ষা, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা।

রহমান শেখ মুজিবুর (২০১২), অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

রহমান শেখ মুজিবুর (২০১৮), কারাগোরের রোজনামচা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

রহমান শেখ মুজিবুর (২০২০), আমার দেখা নয়া চীন, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

হোসেন মোঃ রকিব, শাহ মোহাম্মদ সানাউল হক, মোহাম্মদ আবুল কাসেম মজুমদার, এম আরিফুর রহমান, মোহাম্মদ রেজাউল করিম এবং আফিয়া রহমান (২০২১), ইডুকেশনাল ফিলোসফি এন্ড থটস অব বঙ্গবন্ধু: এন এনালাইসিস অব বাংলাদেশ ইডুকেশন কমিশন রিপোর্ট ১৯৭৪, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

আহমেদ মঞ্জুর (২০২১), Building on Bangabanhu's Education Vision, The Daily Star, 12 March, Available at: https://www.thedailystar.net/opinion/news/building-bangabandhus-education-vision-2058941

Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), (2019), Bangladesh Statistics 2019,

Statistics and Informatics Division, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh

Dhaka University Talk (2020), বঙ্গবন্ধুর উচ্চ শিক্ষা ভাবনা, ডঃ আতিউর রহমান, ইউটিউব ভিডিও [১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০], প্রাপ্যতা: https://www.youtube.com/watch?v=HDpiY7Hj6Z0

করিম মোহাম্মদ রেজাউল (২০১৫), Public Education Spending and Income Inequality in Bangladesh, International Journal of Social Science and Humanities, vol. 5, no. pp. 75-79

করিম মোহাম্মদ রেজাউল ও নন্দি কল্যানী (২০১৩), 'The Comparative Study of Distributional effects of Public Expenditure on Education in Bangladesh and Thailand', National Academy for Educational Management Journal, vol. 8, no. 16, pp.145-152